নিরাপদ সড়কঃ প্রত্যাশা-প্রাপ্তি-করণীয়

কুন্তল বিশ্বাস

নিরাপদ সড়ক বিষয়ে জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে ২০১৭ সাল থেকে প্রতিবছর ২২ অক্টোবর সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন সংস্থা ও প্রতিষ্ঠান নানা কর্মসূচির মাধ্যমে "নিরাপদ সড়ক দিবস" পালন করে থাকে। শুধু দিবস পালন নয়, নিরাপদ সড়কের জন্য ধর্মঘট, মিছিল, সমাবেশ কত কিছুই না হলো। যার মধ্যে সাম্প্রতিক সময়ে সবচেয়ে আলোচিত ঘটনা হলো নিরাপদ সড়কের জন্য ছাত্র-আন্দোলন, যার প্রেক্ষিতে আমরা পেলাম নতুন সড়ক আইন। কিন্তু এত কিছুর পরে আদৌ কি আমরা নিরাপদ সড়ক নিশ্চিত করতে পেরেছি? সড়ক দুর্ঘটনা কি কমিয়ে আনতে পেরেছি? বি আর টি এ এর প্রতিবেদন অনুযায়ী, গত সেপ্টেম্বর মাসেই ৪৫৪ টি সড়ক দুর্ঘটনায় ৪১০ জন নিহত এবং ৬০৯ জন আহত হয়েছেন। বলা যায়, সড়ক-মহাসড়কে দুর্ঘটনার ব্যাপকতা যেন কিছুতেই রোধ করা যাচ্ছে না।

সড়ক দুর্ঘটনার বিষয়গুলো পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, চালকদের অদক্ষতা, বেপরোয়া গতিতে গাড়ি চালানো, চালকদের ওভারটেকিং করার প্রবল মানসিকতা, ড্রাইভিং লাইসেন্স প্রাপ্তিতে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহির অভাব, জনগণের সচেতনতার অভাব, ট্রাফিক আইন কিংবা রাস্তায় চলাচলের নিয়ম না মানাকে দুর্ঘটনার মুখ্য ও অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কারণ হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। অন্যান্য কারণের মধ্যে রয়েছে পরিকল্পনাহীনভাবে অনেক সড়ক-মহাসড়ক নির্মাণ, নির্দিষ্ট লেন না মেনে চালকদের গাড়ি চালানোর প্রবণতা, রাস্তায় বিপজ্জনক বাঁকে সতর্ক সংকেতের অভাব, ফিটনেসবিহীন গাড়ি চালানো, মাদকাসক্ত অবস্থায় গাড়ি চালানো, উল্টো পথে গাড়ি চালানো, পথচারীদের ট্রাফিক আইন না মানার প্রবণতা, সেফটি বেল্ট না ব্যবহার করার প্রবণতা, ফুটপাতে অবৈধ দখল ও দোকানপাট, ওভার ব্রিজ থাকলেও ব্যবহার না করার প্রবণতা, যত্রতত্র গাড়ি পার্কিং করা, মোটরসাইকেলের ব্যবহার বৃদ্ধি ইত্যাদি।

উপরের সমস্যাগুলো সড়কে মৃত্যুর অন্যতম কারণ হওয়ায় এসব সমস্যা ও এর সম্ভাব্য সমাধান নিয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করা প্রয়োজন। প্রথমত, বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গেছে, ৯০ শতাংশ সড়ক দুর্ঘটনার জন্য দায়ী চালকের বেপরোয়া মনোভাব ও যানবাহনের অতিরিক্ত গতি। গতি যত বেশি, দুর্ঘটনার মাত্রা ও মৃত্যুঝুঁকি তত বেশি। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে, গড়ে ৫ শতাংশ গতি কমালে দুর্ঘটনার ঝুঁকি ৩০ শতাংশে কমে আসে। একারণে, চালকদের নির্দিষ্ট গতি মেনে চলতে বাধ্য করা হলে দুর্ঘটনা অনেক কমে আসবে। এক্ষেত্রে, মহাসড়কে যান চলাচলের সর্বোচ্চ গতিসীমা নির্ধারণ এবং গতি পরিমাপক যন্ত্র ব্যবহার করে সেটিকে কঠোরভাবে তদারকি করতে হবে। দ্বিতীয়ত, দুর্ঘটনা রোধে চালকের দক্ষতার পাশাপাশি চালকের শারীরিক ও মানসিক সক্ষমতা থাকা প্রয়োজন। কিন্তু আফসোসের বিষয় হলো, অধিকাংশ চালকেরই উপযুক্ত প্রশিক্ষণ নেই। ফলে তারা জানেন না সড়কের সাইন, সিগন্যাল বা মার্কিং কীভাবে ব্যবহার করতে হয়। সড়কের প্রকারভেদ ও নির্দেশিকা না জানা এই চালকেরাই দুর্ঘটনা ঘটাচ্ছেন। চালকদের লাইসেন্স প্রদানের পরীক্ষার সময় দক্ষতা ও সুস্থতা যথাযথভাবে যাচাই করা হলে দুর্ঘটনা কমানো সম্ভব হবে। তৃতীয়ত, নিরাপদ যাতায়াতের জন্য সড়কের ডিজাইন ও অবকাঠামো গুরত্বপূর্ণ। সড়কে যদি গর্ত থাকে, যদি ঝুঁকিপূর্ণ বাঁক থাকে, সড়কের বাঁক ও সেতুর এক পাশ হতে অপর পাশে যদি দেখা না যায়, তাহলে দুর্ঘটনার ঝুঁকি বাড়ে। সাধারণত সড়কে গর্ত দেখা দেয় অতিরিক্ত বৃষ্টির কারণে পানিজমা সড়কে ভারী যানবাহন চলাচলের কারণে। এক্ষেত্রে সড়ক নির্মাণের সময় সঠিক পরিকল্পনা ও ডিজাইন অনুসরণ করা এবং উন্নত কাঁচামালের ব্যবহার, অনুমোদিত সীমার অতিরিক্ত ওজনবাহী যানবাহন চলাচল না করতে দেয়া, পানি নিষ্কাশনের পর্যাপ্ত ব্যবস্থা রাখা, সড়কে সঠিক উপায়ে ও পর্যাপ্ত পরিমাণে রোড সাইন ও মার্কিং এর ব্যবহার, ঝুঁকিপূর্ণ অংশের ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী সতর্ক সংকেতের ব্যবহার ইত্যাদি নিশ্চিত করতে পারলে দুর্ঘটনা অনেকাংশেই কমে। চতুর্থত, ত্রুটিপূর্ণ যানবাহন ও পরিবহন মালিকদের অতিরিক্ত লাভ করার মানসিকতা সড়ক দুর্ঘটনার আরেকটি অন্যতম কারণ।

যে কোনো যানবাহনের ফিটনেস খুবই গুরুত্বপূর্ণ। গাড়ির যদি ফিটনেস না থাকে, তবে সে গাড়ি সড়কে দুর্ঘটনার কারণ হবে। বর্তমানে দেশে ফিটনেসবিহীন ও মেয়াদোত্তীর্ণ যানবাহনের সংখ্যা ৫ লাখের বেশি। একারণে কোন যানবাহন সড়কে চলাচলের অনুমতি দেওয়ার পূর্বে সেটি চলাচলের উপযোগী কী না এটা সর্বপ্রথম প্রাধান্য পাবে। গাড়ির নিবন্ধন প্রদান এবং নিবন্ধন নবায়নের সময় গাড়ির সকল যন্ত্রাংশের মান এবং গাড়িতে চালক ও যাত্রীর সুরক্ষার বিষয়টি নিশ্চিত করা জরুরি। সড়কে চলাচল শুরুর পূর্বে কয়েকটি গাড়ির যন্ত্রাংশ ও ব্রেক চেকিং না করায় এবছর কিছু দুর্ঘটনার তথ্য পাওয়া গেছে। আবার, গণপরিবহন সংস্থাগুলো বাড়তি যাত্রীর চাপ সামাল দিতে ও বেশি মুনাফার লোভে চালকদের গতিসীমার বাইরে দ্রুত গাড়ি চালিয়ে বেশি ট্রিপ দিতে আর নির্ধারিত সময়ের বেশি সময় ধরে কাজ করতে বাধ্য করে। ফলে চালকের ওপর এক ধরনের মনস্তাত্ত্বিক চাপ পড়ে এবং ক্লান্ত-শ্রান্ত অবস্থায় গাড়ি চালালে স্বভাবতই তাতে দুর্ঘটনার ঝুঁকি বেড়ে যায়। একারণে, পরিবহনমালিক যাঁরা আছেন, ব্যবসার পাশাপাশি তাঁদের সচেতনতার ও দায়িত্ববোধের পরিচয় দিতে হবে। যদি তাদের শুধু ব্যবসা করার আর অর্থ উপার্জন করার মানসিকতা থাকে, তাহলে সড়ক নিরাপদ হবে না। গাড়ির ফিটনেস চেক, দক্ষ ও সুস্থ চালক নিয়োগ, ট্রিপ বেসিসে গাড়ি না চালানো ইত্যাদি ব্যাপারে মালিকদের সচেতনতার পরিচয় দিতে হবে। পঞ্চমত, যাত্রীর নিরাপত্তায় সিটবেল্ট একটা অপরিহার্য বিষয়। গাড়িচালকের পাশাপাশি যাত্রীদের সিটবেল্ট ব্যবহার অনেক দেশেই বাধ্যতামূলক। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আমাদের দেশের অধিকাংশ চালক কিংবা যাত্রী সিটবেল্ট ব্যবহারে আগ্রহী নন। ফলে, সামনে বা পেছন থেকে কোনো গাড়ি দুর্ঘটনায় পতিত হলে পেছনের যাত্রী সামনের দিকে ছিটকে পড়ে এবং সামনের-পিছনের সকল মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এছাড়া অনেক দেশে শিশুদের জন্য পৃথক আসন ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা লক্ষ্য করা যায়। কারণ, গাড়িতে যে আসন থাকে, তা প্রাপ্তবয়স্কদের উপযোগী আসন। সেই আসন শিশুদের সিটবেল্টের যথাযথ প্রয়োগ কিংবা শারীরিক কাঠামোগত উপযোগী নয়। ফলে দুর্ঘটনা ঘটলে শিশুরা দ্রুত আসন থেকে ছিটকে পড়ে এবং মৃত্যুমুখে পতিত হয়। একারণে আমাদের নিরাপদ সড়ক ব্যবস্থাপনায় সিটবেল্টের পাশাপাশি শিশু আসনের উপযোগিতা ও গুরুত্ব সমানভাবে স্থান পেতে হবে।

ষষ্ঠত, পরিসংখ্যান বলছে বাংলাদেশে পথচারীদের মৃত্যুহার সবচেয়ে বেশি। এজন্য পথচারীবান্ধব যাতায়াত ব্যবস্থা গড়ে তোলা প্রয়োজন। সিগন্যাল ও জেব্রা ক্রসিংয়ে গাড়ি না থামানো, পথচারীদের রাস্তা পারাপারের পর্যাপ্ত সুযোগ না থাকা বা থাকলেও ব্যবহার না

করার প্রবণতা ইত্যাদি কারণে সড়কে পথচারীদের গুরুতর আহত ও নিহত হওয়ার সংখ্যা বাড়ছে। সকল সড়কে পথচারীদের সড়ক পারাপারের নিরাপদ ব্যবস্থা ও নিরাপদ ফুটপাতের ব্যবস্থা রাখা জরুরি। এছাড়াও, বর্তমানে আমাদের দেশে নিরাপদ সড়ক প্রতিষ্ঠায় অন্যতম অন্তরায় হচ্ছে মোটরসাইকেল। বাংলাদেশের মত ঘনবসতিপূর্ণ দেশে যানজট ও গণপরিবহণের ভোগান্তি হতে মুক্তি পেতে মানুষ মোটরসাইকেল ব্যবহারে ঝুঁকছে। কিন্তু, অতিরিক্ত গতি ও সঠিক হেলমেট ব্যবহার না করার কারণে দুর্ঘটনা বাড়ছে। গতিসীমা মেনে চলা ও মানসম্মত হেলমেট ব্যবহারের মাধ্যমে চালক ও যাত্রীদের মৃত্যু কমিয়ে আনা সম্ভব। সবশেষে, দুর্ঘটনা ঘটার পর আহত ব্যক্তিদের দ্রুত চিকিৎসা প্রদানের ক্ষেত্রে আমরা অনেকটাই পিছিয়ে। সঠিক সময়ে চিকিৎসা না হলে বিশেষ করে প্রাথমিক চিকিৎসাসহ আহত ব্যক্তিদের দ্রুত হাসপাতালে স্থানান্তর না করার কারণে আহত ব্যক্তির জীবনের শঙ্কা থেকেই যায়। এ কারণে, হাইওয়েতে ট্রমা সেন্টার ও রেসকিউ টিম (অ্যাম্বুলেন্স-সুবিধাসহ) অপরিহার্য।

উচ্চ আয়ের দেশগুলোর তুলনায় বাংলাদেশে বার্ষিক সড়ক দুর্ঘটনাজনিত মৃত্যুহার প্রায় দ্বিগুণ, যার মধ্যে শিশু ও কর্মক্ষম বয়সের মানুষ সবচেয়ে বেশি। এ কারণে ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি উন্নত দেশে পরিণত হতে হলে নিরাপদ সড়কের বিষয়টি বিশেষ গুরুত্বসহকারে দেখতে হবে। বিশ্বব্যাংক এর হিসাব অনুযায়ী, আগামী দশকে সড়ক ব্যবস্থা নিরাপদ করতে বাংলাদেশকে বিনিয়োগ করতে হবে প্রায় ৭৮০ কোটি মার্কিন ডলার। তাই সড়ক দুর্ঘটনা এখন শুধু মানবিক নয়, অর্থনৈতিক সমস্যা হয়েও দাঁড়িয়েছে। শুধু জাতীয়ভাবেই নয়, আন্তর্জাতিক অঙ্গনেও নিরাপদ সড়কের গুরুত্ব অনুধাবন করে জাতিসংঘ ২০১১ থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত সময়কে সড়ক নিরাপত্তা দশক হিসেবে ঘোষণা করেছিলো। সদস্য দেশগুলো এ সময়ের মধ্যে সড়ক দুর্ঘটনার সংখ্যা ও প্রাণহানি অর্ধেকে নামিয়ে আনার বিষয়ে একমতও হয়েছিলো, যা টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রায় (এসডিজি) অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এরই মধ্যে বহু দেশে সড়ক নিরাপত্তায় দৃশ্যমান অগ্রগতি লক্ষ্য করা গেলেও বাংলাদেশে এ লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে কিছুটা পিছিয়ে। তবে সরকার সড়ক পরিবহন ব্যবস্থায় অভূতপূর্ব উন্নয়নের পাশাপাশি নিরাপদ সড়ক ব্যবস্থা জোরদার করার বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করছে। সড়ককে নিরাপদ করতে ২ লেনের সড়ক ৪ লেনে উন্নীতকরণ, নির্দিষ্ট দূরত্বের ব্যবধানে মহাসড়কে চালকদের জন্য বিশ্রামাগার নির্মাণ, ট্রমা সেন্টার স্থাপন, সড়কে ডিভাইডার স্থাপন, বাঁক সরলীকরণ ও গতি নিয়ন্ত্রক বসানোসহ নানামুখী উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। সড়ক পরিবহন সেক্টরে শৃঙ্খলা আনতে দক্ষ চালক তৈরি এবং দুর্ঘটনা নিয়ন্ত্রণে টাস্কফোর্স গঠন করা হয়েছে। সড়ক নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে স্বয়ংক্রিয় মোটরযান ফিটনেস সেন্টার ও ই-ড্রাইভিং লাইসেন্স প্রবর্তন করা হয়েছে। বিশ্বব্যাংকের আর্থিক সহায়তায় পাঁচ হাজার কোটি টাকা ব্যয়ে 'বাংলাদেশ রোড সেফটি প্রজেক্ট' বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

সড়কের অধিকাংশ মৃত্যুকে "দুর্ঘটনা" বলে অভিহিত করা হলেও এটা মূলত মানবসৃষ্ট। কারণ, সাধারণত যে সকল নেতিবাচক ঘটনায় মানুষের কোনো নিয়ন্ত্রণ থাকেনা, সেসব ঘটনাকে দুর্ঘটনা বলা হয়। এরূপ ঘটনার কোনো পূর্বাভাস করা যায় না, তাই প্রতিরোধ বা প্রতিকারমূলক ব্যবস্থাও নেয়া যায় না। কিন্তু সড়কে মৃত্যুর মিছিলের অন্যতম কারণ মানবসৃষ্ট বিভিন্ন সমস্যা ও অব্যবস্থাপনা, যা সবাই মিলে চেষ্টা করলে অনেকাংশেই কমিয়ে আনা সম্ভব। তাই, নিরাপদ সড়ক নিশ্চিত করতে প্রকৌশলগত ত্রুটি অপসারণের পাশাপাশি আইনের বাস্তবায়ন এবং সড়ক ব্যবহারকারীদের সচেতনতা গুরুত্বপূর্ণ। এক্ষেত্রে জনসচেতনতা তৈরিতে সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি ও স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলো সমন্বিতভাবে যে কাজ করছে সেটিকে আরও জোরদার করা জরুরি। একক কোনো কর্তৃপক্ষ বা সংস্থা নয়, সড়ক নিরাপদ করতে সকলকে একত্রে কাজ করতে হবে। সড়ক আমাদের সকলের, তাই নিরাপদ সড়ক বাস্তবায়নের দায়িত্ব ও আমাদের সকলের। আসুন, ট্রাফিক আইন মেনে চলি; নিজে সচেতন হই, অপরকেও সচেতন করি; তবেই নিরাপদ সড়কের প্রত্যাশা পূরণ হবে।

#

পিআইডি ফিচার

লেখকঃ তথ্য অফিসার, তথ্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা